কাজী জহিরুল ইসলাম জন্মগ্রহন করেন বাংলাদেশের ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলায়। তিনি আশির দশকের কবি। দেশের প্রায় সব পত্র পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী এবং প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯। কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কবি জসীম উদ্‌দীন পুরস্কার ১৪০৬' এ ভূষিত। বর্তমানে জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসাবে আইভরি কোস্টে কর্মরত। আন্তর্জালের একজন নিয়মিত লেখক। *'কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ও তারুণ্যের প্রতি পক্ষপাত'* শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন কবি আল মাহমুদ, যেটি আল মাহমুদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবির সৃজন-বেদন'-এ সংকলিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'ক্রোধ আছে-কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসা-স্বপ্ন-তৃষ্ণা প্রবলতর অর্থাৎ জিজীবিষা আর ইতিবাচকতা। কাজী জহিরুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত সপ্রেম দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন জীবন ও পৃথিবীর দিকে, ভালোবাসাতেই সিক্ত করেছেন মরুভূমির আতপ্ত হৃদয়'। সেই ভালোবাসার আলোয় স্নাত উপন্যাস 'গ্রহান্তরের সুখ' সাতরঙের পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

-সম্পাদক, সাতরঙ

গ্র হা ন্ত রে র সু খ

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

।। তিন ।।

দিনের প্রথম কাজটি করার জন্য বাথরুমে ঢোকে অমিত। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ আসছে। অনেকক্ষণ ফ্লাশ না টানলে এই গন্ধটা হয়। ফ্লাশ টানতে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওর, পানি নেই। বড় ড্রামটার পানিও তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে, মগ দিয়ে তোলা মুশকিল। অন্য সময় হলে এটা সহ্য হয়, সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি বাথরুম সংক্রান্ত একটা যুদ্ধে নামতে হয় তাহলে কারোরই মেজাজ ঠিক থাকার কথা না। অমিতেরও মেজাজ ঠিক নেই। বাড়িঅলা বেটা হাঁড়ে হাঁড়ে বজ্জাত, লিটার মেপে পানি তোলে। কিছু বলতে গেলেই কঞ্জুসটা দাঁত বের করে হাসে, মোলায়েম একটা হাসি দিয়ে বাঁ হাতে দাঁড়িগুলো খিলাল করে। এসব দেখলে দ্বিতীয় দফায় মেজাজ খারাপ হয়। লোকটার কাজ কর্ম দেখলে মনে হয় ভাড়াটিয়াদের ক্ষেপাতে পারলেই যেন তার আনন্দ। পাঁচতলার ছাদে পানি তুলতে মিনিটে কয়টাকা বিদ্যুৎ খরচ হয়, পাই পাই করে সে হিসেবটা শুনিয়ে দেয়। আর একটু সুযোগ পেলেই জুলাই মাসে বাড়িভাড়া বাড়ানোর আগাম খবরটা দিতে একটুও ভুল করে না। এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে শ্রোতাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ধীরে ধীরে বাথরুমে ঢুকে যায়। বাথরুমের দরোজা খোলাই থাকে।

তিনি বেসিনের ওপর হাসের পায়খানা করার মতো পুচ করে পানের পিক ফেলেন। নোংরা হয়ে যাওয়া বেসিনের ওপর বালতি থেকে ডাঁট ভাঙা প্লাস্টিকের সবুজ মগটা দিয়ে খানিকটা পানি তুলে ছিটিয়ে দেন। এতে বেসিনটা আরো বিশ্রী দেখায়। নিচু হয়ে বালতি থেকে পানি তুলবার সময় তার শাদা লুঙ্গির নিচের অংশটা স্যাতস্যাতে বাথরুমের ফ্লোরে লুটোপুটি খায়, ভিজে যায়। এতে বুঝি তার কিছুটা মেজাজ খারাপ হয়। তিনি খিটখিটে মেজাজ নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর বলেন, যান, কমোডে বইসা পড়েন। মেশিন চালু দিতাছি। এ কথা বলার সময় লোকটার মুখ থেকে তাম্বুলের রস ঠোটের কোনা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাতে ওর দাড়ি ভেজে, হাতাঅলা শাদা গেঞ্জির বুক ভিজে লাল হয়ে যায়।

মেশিন তিনি চালু দেন ঠিকই। পানিও আসে। কিন্তু ততোক্ষণে দূর্গন্ধে নাড়ি-ভূড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। দু'একটা আরশোলা কমোডের মধ্যে হাঁটাহাঁটিও শুরু করে দেয়। গা ঘিন ঘিন করে।

তারপরেও মোখলেছউদ্দিনকে অমিতের বেশ পছন্দই হয়। বাড়িঅলাতো ব্যাবসায়ী। ব্যাবসায়ী তার ব্যাবসায়ের লাভ-ক্ষতির হিসেব করবে এটাই স্বাভাবিক। এতে দোষের কিছু নাই। বাড়িঅলা হিসাবে পছন্দ না হলেও মানুষ হিসাবে পছন্দ হয়। অমিতের সঙ্গে এক সকালে অনেক গল্প করেছে মোখলেছউদ্দিন। এসব গল্পের একটাই সারবস্তু। জগতে টাকা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের তেমন কোনো মূল্য নেই।

কলিং বেলের শব্দ শুনে অমিত নিজেই দরোজা খোলে সেদিন

কেমন আছো বাবা?

মোখলেছউদ্দিনের কণ্ঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর, দরদি কণ্ঠ।

জ্বী ভালো। আজতো একত্রিশ তারিখ চাচা। একত্রিশে ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাস একত্রিশ দিনে হয়। এক তারিখ আসতে আরো একদিন বাকী। তাছাড়া আপনার আসারতো কোনো প্রয়োজন দেখি না। ভাইয়া নিজে গিয়েইতো প্রতি মাসের এক তারিখে বাড়ি ভাড়া দিয়ে আসেন।

মোখলেছউদ্দিন লজ্জা লজ্জা মুখ করে অমিতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। লোকটার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে? এতোগুলো কথা শোনার পরও কিছুই বলছে না। এটা একটা আস্বাভাবিক ঘটনা। অমিত এই প্রথম এই লোককে লজ্জা পেতে দেখলো। লজ্জা পাওয়ায় ওর কাঁচা-পাকা দাড়িতে শোভিত মেদবহুল মুখটিকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কেমন একটা নূরানী চেহারা হয়েছে, মায়া মায়া ভাব এসেছে।

যুবক বয়সের ছেলে-মেয়েরা খুব সহজেই কোনো কিছুতে বিস্মিত হয় না। বিস্ময়ে অবাক হয় শিশুরা। যুবক বয়স হলো আবিস্কারের বয়স, বিস্ময়কে জয় করার বয়স। কিন্তু অমিত শুধু বিস্মিতই হয় না, ওর জীবনে বিস্মিত হবার সেরা ঘটনাটি ঘটে। মোখলেছউদ্দিন কোনো কথা না বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। এই বয়সের একজন মানুষের মধ্যে যে কেঁদে ফেলবার মতো এতোটা আবেগ থাকতে পারে এটা অমিতের ধারনার বাইরে ছিলো। অমিত খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। ভাইয়া কিংবা ভাবী এসে পড়লে একটা যাচ্ছেতাই কান্ড ঘটে যাবে। নিজেকে ওর খুব অপরাধী মনে হয়। এতোটা রূঢ় হওয়া ওর উচিত হয় নি। কান্না সংবরণ করার কোনো চেষ্টাও করছেন না মোখলেছউদ্দিন। চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। আর তিনি তাকিয়ে আছেন অমিতের মুখের দিকে। এতে অমিতের অপরাধবোধটা আরো বেড়ে যায়। মোখলেছউদ্দিনের ঠোঁট এবং চোখের নিচের অংশটা কুচকে গিয়ে ওর মুখটা বেশ বিকৃত হয়ে আছে। তিনি মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চশমার কাচ পাঞ্জাবীর কোনা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিস্কার করেন। যেন চোখ দিয়ে পানি আসাটা হয়েছে চশমার দোষ।

তোমরা আমাকে খুব নিকৃষ্ট মানুষ ভাবো, আমি বাড়ি ভাড়া দিয়ে খাই।

অমিতের দিকে না তাকিয়ে, চশমার কাচের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মোখলেছউদ্দিন। অমিত একটা মওকা পায় কথা বলার, যদি এতে ভদ্রলোকের চোখের জল থামানো যায়।

তা ভাববো কেনো চাচা। বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা অন্যায় কিছু না। যাদের বাড়ি আছে, সবাই দেয়। আমাদের থাকলে আমরাও দিতাম। চাচা ঘরে আসেন, বসে কথা বলি।

জ্বি না বাবজান। আমি ঘরে যাবো না। তুমি একটু ওপরে আসবা, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

জ্বি আসবো এক সময়।

এক সময় না, এখনি আসো।

আমাকে যে অফিসে যেতে হবে চাচা।

একদিন অফিসে দেরী করে গেলে কিছু হয় না।

কথাটা বলেই সিঁড়িতে পা রাখেন মোখলেছউদ্দিন, পেছনে আর ফিরে তাকান না। তিনটি সিঁড়ি ভেঙেই তিনি আবার ফিরে আসেন। অমিত ততোক্ষণে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কলিং বেল বেজে ওঠে, দরোজা খোলে অমিত।

আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি। শোন বাবা, আমি বাড়ি ভাড়া চাইতে আসি নাই। পাঁচ বছর আগে আজকের দিনে আমার বড় সন্তান আলো মারা গেছে। তোমাকে দেখলে আমার আলোর কথা মনে পড়ে। তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

অন্যের ছেলে কখনো নিজের ছেলে হয় না। অমিতও কখনো আলো হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মোখলেছউদ্দিনের পিতৃহৃদয়ে অমিত আলো হয়ে ধরা দেয়।

মানুষটির প্রতি এক ধরণের মমতার অনুভূতি টের পায় অমিত। অপরাধবোধের প্রায়শ্চিত্য করার জন্যই হোক আর মমতার টানেই হোক দশ মিনিটের মাথায় মোখলেছউদ্দিনের ফ্লাটে গিয়ে উপস্থিত হয় অমিত।। মোখলেছউদ্দিন তিনতলায় থাকেন, পুরো ফ্লোরে একটিই ফ্লাট। অমিতরা থাকে দোতলায়। দোতলাসহ অন্যান্য ফ্লোরগুলোতে দুটি করে ফ্ল্যাট।

তিনতলায় গিয়ে অমিত তাজ্জব বনে যায়। মানুষ চিরকাল পৃথিবীতে থাকতে আসে না। মানুষের জন্ম হয় মৃত্যুবরণ করার জন্য। একদিন না একদিন সবাইকেই যেতে হবে। এই ভদ্রলোকের ছেলে না হয় ক'দিন আগেই গেছে। অল্প বয়সে অনেকেরই মেয়ে-ছেলে মারা যায়। যুবক বয়সের ছেলে মরে গেলে শোকটা দীর্ঘদিন থাকে। কিন্তু মোখলেছউদ্দিন পরিবারে আলোর মৃত্যুশোক একটা স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে। ড্রয়িংরুমের চারপাশের দেয়ালে আলোর একুশটা ছবি রূপার ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। প্রতিটা ছবিই তাজা ফুলের মালায় শোভিত, বেলী ফুলের মালা। পুরো ঘরে বেলী ফুলের একটা মৃদু সুবাস ছড়িয়ে আছে। নিজের চেহারা সব মানুষ ভালো করে চিনতে পারে না। কিন্তু অমিত পারে। সাধারণত যারা নিজেদেরকে সুদর্শন মনে করে তারা ঘন ঘন আয়নায় নিজের মুখ দেখে। রোজ বিকাল-সকাল বেশ ক'বার আয়না দেখার ফলে অমিত নিজের চেহারা চেনে, খুব ভালো করেই চেনে। সেই চেহারার সঙ্গে এই ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একুশটি ছবির কোনো একটিরও মিল নেই। তারপরও মোখলেছউদ্দিন পরিবারের চোখে অমিত আলো হয়ে গেলো।

চাচা বলেন, কি কথা বলবেন।

তেমন কোনো কথা না বাবা। তুমি একটু বসো, তোমাকে দেখি।

অমিতের ইচ্ছে হয় বলে, দেখার বস্তু হিসাবে ছেলেদের কোনো কদর নেই দুনিয়াতে। দেখতে হয় মেয়েদের। একটি সুন্দরী মেয়েকে সামনে বসিয়ে রেখে জগতের মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ক্লান্ত হয় না, বিরক্ত হয় না। মোখলেছউদ্দিনকে অবশ্য তেমন কিছুই বলতে পারে না অমিত। এতে তিনি আবারও কেঁদে ফেলতে পারেন। নিজের বাড়িতে স্ত্রী-কণ্যার সামনে কেঁদে ফেললে কেলেঙ্কারী কান্ড হয়ে যাবে।

চাচা আলো কি করে মারা গেলো সেই ঘটনাটা বলেন।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য এমন একটা কথা কেনো বললো, ভেবে শঙ্কিত হয় অমিত। সন্তানের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বেন এবং আবারো কাঁদবেন।

আজ না বাবা। তোমাকে আরেকদিন বলবো। আজ তোমাকে অন্য একটি ঘটনা বলি। আলোর জন্মের ঘটনা।

জ্বী বলেন।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অমিত। বাঁচা গেলো।

আমি তখন বেকার। পড়ালেখা খুব একটা করতে পারি নাই। থার্ড ডিভিশনে আই,এ, পাশ করায় পিতা আর বি,এ, ক্লাসে ভর্তি করালেন না। পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেলো। ছেলে সংসারী হলে আয়-রোজগার করবে এই ভরসায় আব্বা আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বেকার জীবন, তোমার চাচীকে খাওয়াবো কি? আমাদের ছিলো টানাটানির সংসার। তাই তোমার চাচীকে তার বাপের বাড়িতেই রাখতে হলো। বুঝলে বাবা এ সংসারে টাকাপয়সাহীন মানুষ সর্বার্থেই অর্থহীন। পকেটে টাকা না থাকলে বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ হয় না।

কথাটা বলেই একটা ম্যারাথন নিঃশ্বাস ছাড়েন মোখলেছউদ্দিন।

দুই বছর সে তার বাপের বাড়িতেই থাকে। ঢাকা শহরে আমাবস্যা-পূর্ণিমা টের পাওয়া যায় না। সেদিন ছিলো জোছনা রাত। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নে দেখলাম, ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছি আমরা দু'জন, তোমার চাচী আর আমি। হঠাৎ পা ফসকে তোমার চাচী নিচে পড়ে গেলো। নিচে নর্দমার নোংরা পানি। আমি তখন ঢাকার সেগুনবাগিচায় আমার মেজো মামার বাড়িতে আশ্রিত। অনেকটা চাকর-বাকরের মতো আছি। তবে পদমর্যাদায় আমাকে আত্মীয় বলতে ওরা কখনো কার্পণ্য করতো না। ঘুম ভেঙে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। সোজা খালি গায়ে, খালি পায়ে ছাদে চলে যাই। ছাদে গিয়ে দেখি আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝরাতের নীরব ঢাকা শহর জোছনায় গোসল করছে। কী তীব্র নীল জোছনা। চাঁদের আলো যে এতো তীব্র হতে পারে আমার আগে জানা ছিলো না। আমি তখন পাগলের মতো গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করলাম,

'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'

পরদিন সকালে আমার ছোট শালা খবর নিয়ে এলো, ওর ভাগ্নে হয়েছে। হয়েছে গত রাতে, রাত তিনটা সময়। ঠিক ওই সময়টাতেই আমি উদোম গায়ে ছাদে গান গাইছিলাম। সেদিন ছিলো ১৯৬৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার দিবাগত রাত। আমার এই তেপ্পান্ন বছরের জীবনে এতো খুশি আমি আর কোনোদিন হই নাই। প্রথম সন্তানের জন্মের খবর একজন বাবার কাছে কী-যে আনন্দের তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তোমার যখন সন্তান হবে, তখন বুঝতে পারবে। আমি তখনি

ছেলের নাম ঠিক করে ফেললাম, আলো। যার জন্মের সময় পৃথিবী আলোর বন্যায় ভাসছিলো, তার নাম আর কি হতে পারে।

চাচা আজ তাহলে উঠি?

বসো বাবা। এতো উঠি উঠি করছো কেনো? একটা কিছু না খেয়েতো যেতে পারবে না। মা ফাতেমা আমাদের কিছু নাস্তা পানি দাও।

নাস্তা আনতে মোখলেছউদ্দিন নিজেই উঠে গেলেন। আর অমিত তখন ভাবছে আলোর জন্মের দিনটির কথা। ১৯৬৮-র ১০ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার দিবাগত রাত। আলোর বন্যায় ভাসছিলো ঢাকা শহর। হ্যাঁ, সেই জোছনা রাতেই অমিতের জন্ম হয়েছে। ও কি এই কথাটা বলবে মোখলেছউদ্দিনকে? সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অমিত।

ট্রে ভর্তি প্রচুর খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে ফাতেমা। পেছনে পেছনে ঢোকেন মোখলেছউদ্দিন। ফাতেমা মোখলেছউদ্দিনের একমাত্র মেয়ে। অসম্ভব রূপবতী এবং স্বাস্থ্যবতী এই মেয়েটিকে অমিত আগেও দেখেছে তবে কখনো কথা বলে নি। শৈশব থেকে উঠে আসা মুনা আন্টি বিষয়ক ভয়টাই ওকে কথা বলতে দেয় নি। শৈশবের স্মৃতি মানুষ খুব সহজে ভুলতে পারে না। পঁচিশ বছর বয়সের পরে মেমোরি সেলে কোনো কিছু ঢোকানো যেমন কঠিন, তার চেয়ে বেশী কঠিন শৈশবের কোনো স্মৃতি মেমোরি সেল থেকে বের করে দেওয়া। শৈশবের অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে ছয়/সাতজন কিশোরীর সামনে ওকে নেংটো করে ফেলার মতো ভয়াবয় এবং লজ্জার স্মৃতি ওর আর একটিও নেই। মনে হলে এখনো লজ্জায় মরে যায় অমিত, মুখ লুকাতে চায় তাবৎ নারী জাতির কাছ থেকে। ওর কেবলি মনে হয় ওই ছয়/সাতজন কিশোরীই কোনো এক অলৌকিক উপায়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময় এবং ওদের মধ্য থেকেই তৈরী হয়েছে তাবৎ নারীজাতি। কি নিষ্ঠুর ছিলো সেই কিশোরীগুলি। অথচ পৃথিবীর মানুষ ওদেরকেই বলে স্নিগ্ধ, কোমল, তুলনা করে ফুলের সাথে। একটি পাঁচ বছরের শিশুমনে কী তীব্র অপমানবোধ সেদিন জন্মেছিলো, পৃথিবীর মানুষ তা জানে না। এর খেসারত বাইশ বছর ধরে দিচ্ছে অমিত। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শিখেছে ও, শিশুদের নিয়ে তামাশা করা একটি গর্হিত অন্যায়। শিশুরা মানুষ, খেলার পুতুল নয়।

স্লামালেকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

নিন।

ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে অমিতের দিকে একটি সিরামিকের হাফ প্লেট এগিয়ে দেয় ফাতেমা।

নিচ্ছি।

ওর হয়ত উচিত ছিলো বলা, আপনিও বসুন না। কিন্তু অমিত তা বলে না। বরং মেয়েটি দ্রুত বিদায় হলেই ভালো। অমিতের বলা না বলায় কিছুই আসে যায় না, কারণ এটা ফাতেমাদের বাসা, আমিতদের না। ফাতেমা বাবার পাশে বসে পড়লো।

বাবা তুমিও নাও।

মেয়েটির আচরণই বলে দিচ্ছে, ঘর কণ্যার কাজে ইতোমধ্যেই সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে।

না-রে মা, আমি খাব না। আলোকে দে। আমার আলোর খুব প্রিয় পাটিসাপটা পিঠা। খাও বাবা।

মোখলেছউদ্দিন অমিতের প্লেটে আরো একটি পিঠা তুলে দেয়। অমিত হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে সামনের জানালা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে।

আপনি কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আপনারাতো নতুন এসেছেন, তাই জানেন না। প্রতি বছর এই দিনটা এলে বাবা কেমন এবনরমাল হয়ে যান। বোধ হয় প্রকৃতিই বাবাকে জানান দেয় দিনটা এসেছে। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে বিকেলে ভাইয়ার বয়েসী কাউকে বাসায় নিয়ে আসেন। অথচ মজার ব্যাপার কি জানেন, পরদিন সকালে এই দিনের যাবতীয় ঘটনা তিনি ভুলে যান। এই যে দেখছেন পাটিসাপটা পিঠা। প্রতি বছর একত্রিশে ডিসেম্বরে এই পিঠা আমাদের ঘরে তৈরী হয়। ভাইয়ার প্রিয় খাবার।

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে ফাতেমা। কিন শঙ্কা, দ্বিধা, জড়তা নেই। মোখলেছউদ্দিন যেন এসবের কিছুই শুনছেন না। তসবীর দানায় সন্তানের বেহেশত খুঁজছেন।

আশ্চর্য।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করে অমিত।

হ্যাঁ, আশ্চর্য। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ভাইয়াকে বাবা কি-যে ভালোবাসতেন বলে বোঝানো যাবে না।

দূর্গন্ধ ঠেলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে অমিত।

তিনতলার কলিংবেলে চাপ দিতেই ফাতেমা বেরিয়ে আসে।

বাথরুমে পানি নেই, মেশিন ছাড়তে হবে।

ফাতেমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে অমিত, হাসি হাসি মুখ। ওর মুখে আর বিরক্তি ভাবটা নেই। ফাতেমাকে দেখলে আগে যেমন আঁতকে উঠতো, সেই অবস্থাটাও আর নেই। বরং নারীর প্রতি পুরুষের যে সহজাত আকর্ষণ, যে টান থাকে, সেটাই ও অনুভব করছে।

ও, আচ্ছা। ভেতরে আসেন না অমিত ভাই। এক্ষুণি মেশিন ছেড়ে দিচ্ছি।

না, এখন আসবো না। এখনোতো মুখ ধুই নি, দাঁত ব্রাশ করি নি। কিছু খেতে পারবো না। আর খেতে না পারলে কারো বাসায় গিয়ে কি লাভ?

অমিতের কথা শুনে ফাতেমা হেসে ফেলে। খুব উচ্ছসিত হাসি। হাসার সময় ওর, কিঞ্চিৎ মোটার ধাচে, শরীরটা দুলে উঠে। অমিত মজা পায় ওর হাসি দেখে। হাসলে মানুষকে অনেক সহজ লাগে। মানুষের বন্ধ দরোজাগুলো খুলে যায়। ফাতেমা ভাবছে জগতে কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের কথা শুনে হাসতে হয়। খুব সিরিয়াস কথাকেও তারা এমনভাবে বলে যা শুনে না হেসে পারা যায় না। অমিতকে ফাতেমার সেই ধরনের মানুষ মনে হয়। দুঃখ কষ্ট বোধ হয় এদেরকে ছুঁতে পারে না। কিংবা এ-ও হতে পারে, এদের দুঃখ ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী। এই প্রথম অমিত ফাতেমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললো। হঠাৎ এই পরিবর্তনে একটুও অবাক হয় না ফাতেমা। অমিতের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সনাক্ত করেছে, এ ধরনের মানুষের হঠাৎ হঠাৎ এরকম বদলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এতে আতঙ্কিত, বিচলিত বা উদ্বেলিত হওয়ার কিছু নেই।

নাস্তার টেবিলে বসে অপুর কথা ভাবতে শুরু করে অমিত। আর তখনি ওর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। একটা ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ে ফলবতী বৃক্ষের ডাল ভেঙে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। অরণ্যে বাজ পড়ে। সেখানে আগুন লাগে। আগুনে বন পোড়ে, মাঠ পোড়ে। তারপর বৃষ্টি হয়। খরাক্রান্ত মাটিতে তুমুল বৃষ্টিপাত। নতুন ফসলের চারা গজায়। দখিনা বাতাশে জড়াজড়ি করে দোল খায় নতুন ফসল। বিস্তৃত ফসলের মাঠে কৃষকের পবিত্র হাসি। সেই হাসির ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে অমিতের হৃদয়ে।

গতকাল সকালের ঘটনাটিকে ও বার বার রিওয়ান্ড করে দেখতে থাকে।